২৬শে মার্চ ২০২৫
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস

◆ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◆ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সার্বিক তত্ত্বাবধান : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১২ চৈত্র ১৪৩১
২৬ মার্চ ২০২৫

বাণী

আজ ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এরপর দীর্ঘ ন'মাস রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি পরমতসহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন সুসংহত করতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে সাম্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তরুণ প্রজন্ম আমাদের স্বাধীনতার অপূর্ণ স্বপ্নগুলো পূরণে আবারো বুকের তাজা রক্ত দিয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী, সুন্দর ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

তাই আসুন, স্বাধীনতার লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি বৈষম্য ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে আরও বেশি অবদান রাখি। দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে আরও এগিয়ে নিয়ে যাই, বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াক এক নতুন বাংলাদেশ- মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে এই আমার প্রত্যাশা।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

স্বাধীনতা দিবস ২০২৫ : অন্য অনুভূতি

ফরিদা আখতার

বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ। এদেশের মানুষ কখনো অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার মেনে নেয় নি। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে একই বছর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন করেছে। এরপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে; অর্ধ শতাব্দি পার করে পৃথিবীর বুকে টিকে আছে শত বাধা পার করে। দেশের মানুষ সব সময় ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার একটি দেশ চেয়েছে। অনেক আন্দোলন সংগ্রামে প্রচুর মানুষ প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু তবুও প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসে দলমত নির্বিশেষে মানুষ আনন্দ করে। লাল-সবুজ কাপড় পরে। নানা সাইজের পতাকা রিক্সায়, গাড়িতে, বাড়িতে উড়তে থাকে। পতাকা অর্জিত স্বাধীনতার প্রতীক, তাই এর প্রতি মানুষের এক অন্যরকম ভালোবাসা আছে।

এবার ২০২৫ সালের স্বাধীনতা দিবস একটু অন্যরকম অনুভূতি অনুভব করছি। ২০২৪ সালের জুলাই ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান দেশকে নতুন করে স্বাধীন করেছে। ছত্রিশ দিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে প্রায় একহাজার পাঁচশত শহিদ ও ২৩ হাজারের বেশি আহতদের আত্মত্যাগের পর ৫ই আগস্ট বাংলাদেশের মানুষ দ্বিতীয়বার স্বাধীন হয়েছে। এই মনোভাব পতিত সরকার ও তাদের দোসররা ছাড়া প্রায় সবার। ছত্রিশ দিনের আন্দোলন নামে খ্যাত, যা জুলাই ছাড়িয়ে আগস্টের ৫ তারিখ পর্যন্ত গড়িয়েছিল - ১৫ বছরের গেঁড়ে বসা ফ্যাসিস্ট সরকারকে হঠাতে পেরেছে। সোজা কথা নয়। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিল তরুণ নারী এবং পুরুষ। সবাই অবাক হয়ে দেখলো একটি নতুন প্রজন্ম উঠে এসেছে যারা নিজের রক্ত দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে; অনেকেই দেশের জন্যে লড়তে গিয়ে আহত হয়ে হাত, পা, চোখ খুইয়ে কষ্টের জীবন বেছে নিয়েছে। এখন যখন তাদের গল্প শুনি তখন দেখি বাইরে গুলি হচ্ছে জেনেও তারা বেরিয়েছিল। না, কোনো হুজুগে যায়নি। বলে গিয়েছিল, 'মা, আমি যদি না ফিরি...।' তারা আত্মত্যাগের মধ্যে নতুন স্বপ্ন দেখেছে এবং একটি নতুন বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছে। তাইতো তাদের কোনো ভয় ছিল না। দীর্ঘ পনেরো বছরের ফ্যাসিস্ট শাসনে মানুষ জর্জরিত ছিল, তা থেকে মুক্তি পেয়েছে। যে ছেলে বা মেয়ের বয়স এখন ২০-২৫ বছর তারা তো জ্ঞান হবার পর থেকে ফ্যাসিস্ট শাসনই শুধু দেখেছে। একটি বিশেষ চেহারা, এবং বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে একটি বিশেষ বয়ান ছাড়া তো কিছু দেখে নি। এই তরুণ যা স্বপ্ন দেখেছে তারই আলোকে ২০২৫ সালের ২৬ মার্চ 'স্বাধীনতা দিবসে' বাংলাদেশকে আমরা নতুন রূপে দেখতে চাই।

আমরা যারা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি তারা দুইবার স্বাধীন হবার আনন্দ পাচ্ছি। কিন্তু গত ৫ আগস্ট যারা নিজেরা আন্দোলন করে স্বাধীন হয়েছেন তাদের জন্যে এটাই প্রথম স্বাধীনতা। তারা বাংলাদেশ নামক দেশের নাগরিক ছিলেন কিন্তু স্বাধীন ছিলেন না। এদের বয়সটা একটু দেখা যাক। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর *পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন*

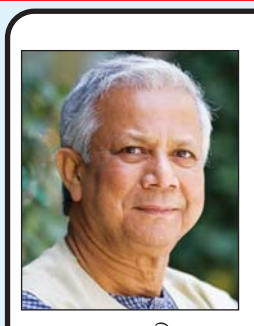

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ চৈত্র ১৪৩১
২৬ মার্চ ২০২৫

বাণী

আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে দেশে এবং প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

স্বাধীনতা অর্জন ছিল আমাদের আত্মমর্যাদা ও অস্তিত্ব রক্ষা এবং অধিকার আদায়ের দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামের চূড়ান্ত ধাপ। যে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়ায়, তার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিলো আজকের এই দিনে। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা।

গত ১৬ বছর দেশের মানুষ এই স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে নাই। স্বৈরাচারি শাসক জগদ্দল পাথরের মতো জনগণের ঘাড়ে চেপে বসে তাদের স্বাধীনতা, মৌলিক সব অধিকার কেঁড়ে নিয়েছিল। ছাত্র-শ্রমিক-জনতার সফল গণঅভ্যুত্থান দেশের মানুষকে স্বৈরাচারের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করতে এবং স্বাধীনতার পূর্ণ সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, জনমুখী ও টেকসই উন্নয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

আসুন, স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসের এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে দেশের উন্নয়ন, শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে কাজ করার শপথ গ্রহণ করি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মুক্তি

মোহাম্মদ আজম

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা এক মনোহর ধারণা। ধারণাটিতে বিলক্ষণ জটিলতা আছে। গতিবিধি ঠিক কোন পর্যায়ে পৌঁছালে কেউ একজন নিজেকে স্বাধীন ভাবতে পারে, বা স্বাধীনতার ধারণাটি অর্থবহ হয়ে ওঠে, তা নির্ধারণ করা মোটেই সহজ নয়। কিন্তু মানুষ যখন স্বাধীনতার কথা বলে, তখন সাধারণভাবে এতটা ভেবে-চিন্তে বলে না। ব্যক্তি, সমষ্টি বা রাষ্ট্র যে প্রসঙ্গেই বলুক না কেন, কথাটা লোকে সাধারণত বেশ শিথিল অর্থেই ব্যবহার করে। মানুষ কথা বলার স্বাধীনতা চায়, আচরণ ও কর্মের স্বাধীনতা চায়; হয়তো সবচেয়ে বেশি চায় নিজের অস্তিত্বকে অন্যের অধীন ভাবতে না-হওয়ার অবস্থা। সংস্কৃতি, ইতিহাস ও শ্রেণিভেদে সে চাওয়ারও ইতরবিশেষ আছে। কোনো এক অবস্থায় কেউ কেউ হয়তো স্বাধীনতার অমিয় সুধা উপভোগ করে, যখন সে অবস্থাটাই অন্য অনেকের কাছে মনে হতে পারে অসহনীয় বন্দিদশা। এ ব্যাপারে কোনো সার্বিক সংজ্ঞায়ন এ কারণেই খুব সহজ নয়।

দার্শনিকভাবে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা খুবই জটিল ব্যাপার। ব্যক্তি তার সর্ব-অস্তিত্বেই সমষ্টির উপর নির্ভরশীল। মানুষ বাঁচে ভাষার মধ্যে, চিহ্নব্যবস্থার একরাশ পরস্পর-সন্নিহিত জালের মধ্যে। বলা যায়, মানুষ অস্তিত্বগতভাবে স্বাধীন তো নয়ই, বরং গভীরভাবে সাপেক্ষ। যদি ওই গভীর স্তর ছেড়ে একটু সাধারণ বাস্তবের কথা তুলি তাহলেও দেখব, মানুষের উৎপাদন-ব্যবস্থা থেকে শুরু করে সম্পর্কের বিচিত্র জাল পর্যন্ত সবটাই বস্তুত যেকোনো 'স্বাধীন' অস্তিত্বের প্রতিপক্ষ। একসময় মনে করা হতো, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মায়, কিন্তু পরে আবদ্ধ হয় বিরাট জালে। উনিশ-বিশ শতকে বিকশিত ভাবসকল আমাদের নিশ্চিত করে বলছে, জন্মের পরে মানুষ বিচিত্র জালে বা ছলনাজালে বন্দি তো হয়ই, কিন্তু জন্মসূত্রে পাওয়া জৈবিক এবং সাংস্কৃতিক জালও অচ্ছেদ্য।

তবু মানুষ স্বাধীনতা চায়। বলা ভালো, পরম স্বাধীনতা অসম্ভব বলেই জ্ঞাতসারে কিংবা অজ্ঞাতে মানুষের স্বাধীনতার আকুতি এত প্রবল। এ চাওয়ার অন্য এক প্রায়োগিক দিকও উপেক্ষণীয় নয়। যেকোনো জাল বা ছাঁচ মানুষের সম্ভাবনার যে সীমা প্রস্তাব করে, তা একদিকে নিরূপিত অন্যদিকে অভ্যস্ততার নিত্যতায় বন্দি। এ ধরনের পরিস্থিতি নতুন চিন্তা ও উদ্যোগ-আয়োজনের বিরোধী। বর্তমান অবস্থা ও অবস্থানকে অতিক্রম করে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাই মানুষের উন্নতির মূল মন্ত্র। এ আকাঙ্ক্ষা থেকেই নতুন উপলব্ধি এবং চাহিদার জন্ম হয়। গভীরতর অর্থে তাই ব্যক্তি-স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সভ্যতার উন্নতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি।

তবে যত মানুষ নিজের স্বাধীনতার দাবি উচ্চারণ করে, তার সিকির সিকিও আসলে নতুন আকাঙ্ক্ষার এ উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারে না। আগেই বলেছি, ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারণার জটিলতাই এর কারণ। মানুষ তাই সামষ্টিক অস্তিত্বের মধ্যে স্বাধীনতা খোঁজে। মানুষ দেশের স্বাধীনতা চায়; রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ভাবার মধ্য দিয়ে নিজের স্বাধীনতার অপূর্ণ বাসনার নিবৃত্তি ঘটায়।

সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব কথাটা আমরা সাধারণভাবে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে থাকি। কথাটার মধ্যে 'চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ' বোঝানোর একটা ইশারা আছে। রাষ্ট্রের কর্মপন্থার জন্য এ অর্থটা বেশ জরুরি। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ খবরদারি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়ন না করতে পারে, তাহলে তার কর্মপ্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। সে বাধা এড়ানোর জন্যই রাষ্ট্রপ্রধানের উপর এক প্রতীকী মূল্য আমরা আরোপ করে থাকি। অতীতে মানুষ রাজা বা সম্রাটকে এভাবেই সংজ্ঞায়িত করত। তখন সাধারণত রাজাকে দেখা হতো স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে, বা অন্তত মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে। আজকের অর্থে না হলেও এক ধরনের সার্বভৌমত্বের ধারণা সঙ্গী করেই রাজা রাজ্যশাসন করতেন। অবস্থার আমূল পরিবর্তন হলেও ধারণাটা আজও প্রায় একই রকম আছে। ব্যক্তির মনোনয়নের পন্থাটা কেবল বদলে গেছে।

রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সার্বভৌমত্ব অন্তত প্রতীকী অর্থে রক্ষা করেই শাসন চালাতে হয়। কথাটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও সত্য। তবে সাধারণভাবে সার্বভৌমত্ব কথাটা আমরা উপলব্ধি করি অন্য দেশের সাপেক্ষে। আমরা ধরে নিই, কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্য দেশ হস্তক্ষেপ করবে না। নিজ দেশের জনগণের পক্ষে সিদ্ধান্তগুলো কর্তৃপক্ষ নিতে পারবে, এবং বাস্তবায়ন করতে পারবে। বাস্তবে এ ধরনের কোনো সার্বভৌমত্ব কোথাও বিরাজ করে না। দেশের অভ্যন্তরে বিস্তর বিরোধের মুখেই ক্ষমতাসীন পক্ষকে কাজ করতে হয়। আর তুলনামূলক গরিব ও দুর্বল দেশগুলোর জন্য বাইরে থেকে

আসে করণীয়ের বিরাট তালিকা। ক্ষেত্রবিশেষে এ ধরনের দেশগুলো নিজেদের ইচ্ছার বাইরে গিয়ে, এমনকি নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে বহু কাজ করতে বাধ্য হয়। এমন নয় যে, বড়ো আর শক্তিশালী দেশগুলোর ক্ষেত্রে এ ধরনের কিছু ঘটে না। আলবত ঘটে। দুনিয়ার মানুষ পরস্পরের সাথে এতটাই সম্পর্কিত যে, আর তাদের সামষ্টিক স্বার্থ এতটাই পরস্পর-নির্ভরশীল যে, শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকেও অন্যদের সাপেক্ষে বহু সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

এসব জেনে-বুঝেও মানুষ সার্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষাটা করে; ভাবতে চায় তার রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আছে। মানসিক স্বস্তির জন্য এরকম ভাবতে পারাটা জরুরি। নিজের ব্যক্তি-স্বাধীনতার আবশ্যিক অনুপস্থিতির ক্ষতি মানুষ পুষিয়ে নিতে চায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কল্পনায়। অবশ্য সুশাসনের জন্য ধারণাটা জরুরি। আবার রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক চুক্তি ও বিনিময় অনেকাংশে সার্বভৌমত্বের ধারণার ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়। বলা যায়, এ এক জরুরি কিন্তু চূড়ান্ত অর্থে অনুপস্থিত ধারণা। মানুষের জীবনে চিহ্নব্যবস্থা এবং প্রতীকের যে গুরুত্ব, তা মেনেই কেবল ধারণাটা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

মুক্তি

আমরা স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের যে কাজ-চলতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম, তা থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, ধারণা দুটি ব্যাপকভাবে বিমূর্ত। মানুষের জীবনে বিমূর্তের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু কেবল বিমূর্ততাতেই তার চলে না। ধারণাগুলোকে তুলনামূলক মূর্তরূপে এবং বাস্তবায়নযোগ্য আকারে উপলব্ধি করার প্রয়োজন হয়। 'মুক্তি' ধারণাটি সেদিক থেকে অনেক বেশি স্পষ্ট। একে ধরাছোঁয়ার আওতায় উপলব্ধি করা সহজ। যেমন, মানুষ বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়, ঋণমুক্ত হয়। কোনো বিশেষ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার এহেন নির্দিষ্টতা থাকায় ধারণাটি তুলনামূলক অন্তরঙ্গ উপলব্ধির আওতায় আসতে পারে।

মুক্তি কথাটা বৃহত্তর জনমানুষের সাথে এ কারণেই অনেক বেশি সম্পর্কিত। বা বলা যায়, অনেক বেশি সম্পর্কিত করে বিবেচনা করা এবং অন্তত খানিকটা স্পষ্টভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। স্বাধীনতা বলি আর সার্বভৌমত্বই বলি, জনমানুষের যাপিত জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে না পারলে কথাগুলোর বিশেষ অর্থ দাঁড়ায় না। কথাটা অন্যভাবে বরং বলা যাক। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ কতগুলো মৌলিক চাহিদা নিরূপণ করেছে। তার আহারের সংস্থান চাই, কাপড় চাই, বাসা-বাড়ি চাই। তুলনামূলক আধুনিক জমানায় এ তালিকায় আরো যুক্ত হয়েছে চিকিৎসা ও শিক্ষা। আজকাল নিরাপত্তার কথাও বলা হয়। এ সংজ্ঞাগুলোর সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো, এর সব কটাই মানুষের জৈবিক অস্তিত্বের সাথে যুক্ত - তার বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্ত।

সত্য হলো এই যে, দুনিয়ার উৎপাদন-ব্যবস্থা অভাবনীয় সব পর্বের মধ্য দিয়ে যাওয়ায় আজ মানুষের হাতে পর্যাপ্ত সম্পদ আছে, যা দুনিয়ার সব মানুষের এসব জৈবিক চাহিদা পরিপূরণের জন্য যথেষ্ট। দুনিয়ার ইতিহাসে সাম্প্রতিক সময়েই কেবল মানুষ এ পরিমাণ উৎপাদনের সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে। কিন্তু এও সত্য, বণ্টনজনিত অসমতার কারণে সে সম্পদের সুফল দুনিয়ার মানুষের এক বড়ো অংশের নাগালের বাইরেই থেকে গেছে। বহু মানুষ আজও বেঁচে থাকার জন্য জরুরি ন্যূনতম চাহিদার সংস্থান করতে পারছে না।

ঠিক এদিক থেকেই মুক্তির ধারণাটা এক বৃহত্তর তাৎপর্যে উন্নীত হয়েছে। স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিঃসন্দেহে জরুরি ধারণা। কিন্তু এর মধ্যে একদিকে অতিরিক্ত বিমূর্ততার সংকট আছে, অন্যদিকে বিপুল অধিকাংশ মানুষের জীবনে তার প্রায়োগিকতা না থাকায় ধারণা হিসাবে এর সর্বজনীনতারও ঘাটতি আছে। 'মুক্তি' কথাটা অনেক বেশি মূর্ত ও সর্বজনীন। এমন নয় যে, পূর্বোক্ত দুই ধারণার সাথে মুক্তি কথাটার কোনো আবশ্যিক বিরোধ আছে। কিন্তু মুক্তির ধারণাকে অঙ্গীভূত না করে বাকি দুই ধারণায় উপনীত হওয়ার মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে ওঠার ঝুঁকি আছে। ঝুঁকিটা নৈতিকও বটে। প্রশ্ন তোলা জরুরি, মানুষের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর অঙ্গীকার ব্যতীত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিমূর্ততা কোনো নৈতিক অবস্থা তৈরি করতে পারে কি? এ প্রশ্নের খুব নিশ্চিত জবাব দেওয়া অত সহজ নয়।

আমাদের স্বাধীনতা

বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা চেয়েছে। প্রাণপণ লড়াই করে অর্জন করেছে স্বাধীন দেশের গৌরবমুকুট। ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন দেশের নাগরিক হওয়ার লড়াইয়েও তার তুরীয় ভূমিকা ছিল। দল গঠন করে, ভোট দিয়ে, রক্ত ঝরিয়ে চেয়েছিল স্বাধীনতার সুখ। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রে স্বাধীন দেশের নাগরিকের মর্যাদা থেকে এ জনগোষ্ঠী বঞ্চিত হয়েছে। বঞ্চনার অবসানের লক্ষ্যে লড়াই করেছে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেতে। কিন্তু সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র আর *পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন*

ডিএফপি নং. ১২/২৫-০৩-২০২৫

স্বাধীনতা দিবস ২০২৫ : অন্য অনুভূতি

ভিত্তিতে ১ জানুয়ারি ২০২৪ সালে প্রাক্কলিত বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৭ কোটি এর বেশি। এই গণনায় নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় বেশি ছিল; নারী ৮ কোটি ৭৩ লাখ এবং পুরুষ ৮ কোটি ৪২ লাখ। অর্থাৎ দেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা ৩১ লাখ ৯০ হাজার বেশি। এটা এর আগের শুমারিগুলোতে দেখা যায়নি। তাহলে জনসংখ্যার অর্ধেক নারী নয়, অর্ধেকের বেশি নারী বলতে হবে। আগে সংখ্যাগতভাবে নারী পিছিয়ে ছিল এখন আর তা নেই।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে ৬০ শতাংশ হচ্ছে ০-২৫ বছর বয়সি, এর মধ্যে ২৭ শতাংশ হচ্ছে ১৫ বছরের কম বয়সের। বাকি ৩৩ শতাংশ ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সের তরুণ-তরুণী। কী এক দারুণ বয়সের জনমিতি। বিস্ফোরণ ঘটানোর বয়স বটে। এই বয়স কাঠামোর সাথে জুলাই অভ্যুত্থানে যারা রাজপথে ছিল তাদের বয়স মিলে যাচ্ছে। তারা তো প্রায় সব এই বয়সের মধ্যেই ছিল। যারা শহিদ হয়েছেন তাদের বয়স এবং যারা আহত হয়েছেন এখনো যারা হাসপাতালে আছে তাদের একটি বড়ো অংশ এই বয়সের। ইতিহাস যদি দেখি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধেও যারা গিয়েছিল তারাও এই বয়সের তরুণই ছিল। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যারা লড়েছিল তারাও কম বয়সের তরুণ-তরুণীরাই ছিল। ক্ষুদিরামের বয়স কি ছিল? ফাঁসি হওয়ার সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর ৭ মাস এবং ১১ দিন! প্রীতিলতা ২১ বছরের ছিল। পুরোনো ছবি দেখলে তাদের দেখা যায়। সব সময়ই তরুণরাই পরিবর্তন এনেছে। অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এখনও তাই হচ্ছে। ইতিহাস তো রিপিট করবেই।

এরা কেউ মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, এদের অনেকের বাবা-মাও দেখেনি। তারা মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে জেনেছে বইয়ে, টেলিভিশনের একপেশে বয়ানে। আর বাস্তবে দেখেছে মানুষের কথা বলার অধিকার নাই। দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকলেও নিজেদের অধিকার আদায়ের কথা বলতে পারেনি। তাদের জেল-জুলুম, গুম, খুন করা হয়েছে। কেউ যদি আওয়ামী লীগ না হয়, তাহলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যায়। ছোটো শিশু বয়স থেকেই তারা এই অন্যায় দেখে এসেছে। যাদের বয়স ১৮ পার হয়েছে মনে করেছে ভোট দেবে। কিন্তু ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ কোনোটাতেই তারা ভোট দিতে পারে নি। গণতন্ত্র মানে কী তা বইয়ের বাইরে আর কিছু তাদের বোঝা হয় নি। বিরোধী দলের কঠোর আন্দোলনের পর এবার বুঝি একটা নির্বাচন হবে এমন আশা অনেকেই করেছিল। কিন্তু না, সেই আশায় গুড়ে বালি।

এই তরুণদের অনেককেই সামাজিক আন্দোলনে সেইভাবে দেখা যায় নি। পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন, নারী আন্দোলন, স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলন - না তাদের দেখা যায় নি। এসব আন্দোলনে বয়স্ক মানুষের সংখ্যাই বেশি। তখন অনেকেই আক্ষেপ করেছে নতুন প্রজন্ম কই? তারা না বুঝলে তো সমাজ এগুবে না। কিন্তু এই তরুণরাই যখন নিজেরা কোনো বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয় তখন ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে যায়। তারা যখন রাস্তায় নামে তখন দলে-বলে নামে। এখন তাদের হাতে মোবাইল আছে, আর আছে ফেসবুক। ডাক দিলেই আসতে পারে। একে অপরকে খবর দেওয়া খুব সহজ। সেটা আমরা দেখেছি ২০১৮ এর কোটা আন্দোলনে এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক আন্দোলনে। ঝাঁকে ঝাঁকে এসে তারা সারা ঢাকা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার চোখ তাদের দিকে নিবদ্ধ। অসম্ভব সাহস আর মেধা। ফ্যাসিস্ট সরকার নিজে ভড়কে গেলেও তাদের পুলিশ দিয়েই শুধু দমন করেনি, ছাত্রলীগ, হেলমেট বাহিনী দিয়ে প্রচন্ড আক্রমণ করে এই কচি শিশুদের রাস্তা থেকে সরিয়েছে। আমরা নির্বাক হয়েছিলাম। প্রতিবাদ করেছি কিন্তু সফল হই নি।

এই ২০২৫ সালে স্বাধীনতা দিবস আরও যে কারণে আমার কাছে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে জুলাই আন্দোলনে নারীরা সামনের সারিতে ছিল। শুধু ছিলই না, নেতৃত্বে ছিল। যে নতুন স্বাধীনতার কথা বলছি, তা নারীদের অর্জন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ২০১৮ সালে যখন কোটা বিরোধী আন্দোলন করছিল তাতে নারীরা অংশ নিয়েছে, নেতৃত্ব ছিল ছাত্রদের হাতে। কোটা বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ কোটার সুবিধা নারীদের জন্যেও ৫ শতাংশ সংরক্ষিত ছিল। বলা যায় কোটার সুবিধাভোগী ছিলেন তারা। সরকারি চাকরিতে এই সুযোগ থাকা অনেক নারীর জন্য সুবিধাজনক ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও নারীরা স্লোগান দিয়েছে 'কোটা না মেধা/মেধা মেধা'। তারা বলেছে আমরা নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেতে চাই, কারো করুণা চাই না। নারীদের এই দৃঢ় অবস্থান পুরো আন্দোলনকে আরও বেগবান করেছে। শেখ হাসিনা রাজাকার বলে গালি দেওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজে মধ্য রাতে প্রতিবাদ মেয়েরাই শুরু করেছিলো। তাতে ছাত্ররাও পরে যোগ দিয়েছিল। পুলিশ ছাত্রদের ধরবে তাই তারা ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আজ প্রায় আট মাস পার হতে চলেছে। নতুন পরিস্থিতি, নতুন অবস্থা। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর গঠিত হয়েছে তাদেরই 'নির্বাচিত' অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, যার অংশ তারাও হয়েছে। এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা। সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছে, তাদের আশা দেশের নাজুক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হবে। তারা একটু শান্তি পাবে। যদিও বিগত সরকারের দুর্নীতি ও লুটপাটের পর অর্থনৈতিক ধ্বংসের পর এই কাজটি খুব কঠিন। ফ্যাসিবাদী সরকার উৎখাত হলেও তাদের পুরো ব্যবস্থাই রয়ে গেছে। থেকে গেছে তাদের অনেক দোসর যারা এখনও সমস্যার সৃষ্টি করেই যাচ্ছে। তবে পরিবর্তিত অবস্থায় অনেক নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যা এতোদিন স্বার্থান্বেষী সরকার মনোযোগ দেয়নি। তারা 'উন্নয়নের' বুলি ঝেড়েছে, যা কি না বড়ো বড়ো বিল্ডিং, রাস্তা, সেতু ইত্যাদির মধ্যে বেশি সীমাবদ্ধব থেকেছে, কিন্তু মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেয়নি। জীবনের মান এবং মর্যাদা পাওয়া প্রত্যেক মানুষের চাহিদা এবং অধিকার। সেটা মেটাতে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচের প্রয়োজন নেই। তবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং প্রান্তিক মানুষের

কাছে পৌঁছানোর চেষ্টাই আনবে ভিন্ন উন্নয়ন। মানুষের উন্নয়ন। তারা রয়েছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলে, পাহাড়ে কিংবা কোনো নদীর চরে। যেখানে উন্নয়ন আপনা আপনি পৌঁছায় না, কিন্তু এখন সে চেষ্টাই করতে হবে। মানুষ আনন্দে থাকে এবং সুস্থ্য থাকে।

নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, সকল ধর্মের মানুষ এক সাথে মিলে মিশে থাকবে এই নতুন বাংলাদেশে। সবার মর্যাদা রক্ষা হবে এটাই আমাদের সামান্য চাওয়া। ❐

লেখক : উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

স্বাধীনতার মোনাজাত

হাসান রোবায়েত

মিঠা নদী মিঠা খেত অপার সবুজ
দোল খায় ধানপাট মাঠের অবুঝ।
চাষা ডাকে জেলে ডাকে ডাকে পোড়া মাঝি
কন্যা-পুতের লাগি রাখে জান বাজি।
শস্যে ধরেছে পাক পুড়ে ছাই দানা
আসমান জ্বলে খাক গরু, মোষ ফানা।
দল ধরে দজ্জাল নামে কালরাতে
খুনের মিছিল ভাসে অন্ন ও ভাতে।
পুঁথি ছিঁড়ে খান খান, পীরের ওয়াজ
রক্তে ভাইসা যায় খিজির খোয়াজ।
শ্মশানবন্ধু নাই সে-ও হিজরতে
ময়লা জমেছে বাঁকা নোলকে ও নথে।
কাতার করেছে সোজা সিনা টান টান
কিষাণ-মজুর-সেনা কসম জবান।
শিশুর বুলির রঙে নামুক প্রভাত
মাবুদ কবুল করো এই মোনাজাত।

মুক্তির সিলসিলা

রুম্মানা জান্নাত

'একদিন এই যুদ্ধ শেষ হবে, আর আমি আমার কবিতার কাছে ফিরে যাব' -এই ভাবনার সামনে একটা শাদা কাগজ নিয়ে বসে থাকি। এই আমার স্বাধীনতা। যখন জুলাইকে লাল করে দিচ্ছিল বাকশালি খুনি- সারারাত সুমসাম অন্ধকারে বসে ভাবতাম, কেমন ছিল রেডিওর দিকে অন্তর তাক করে থাকা সেই দিনগুলো। খোয়াবের দেয়াল টপকে বেশিদূর যাইতে পারি না। কারো খালি-পায়ের কাছে এসে একটা দরিয়া থেমে যাওয়ার কথা মনে আসে।

ঘরের পাশে যে সজনা গাছের ডাল হেলে আছে বয়সের কাছে, আর তার পাশে সহোদরের ভঙ্গিমায় দাঁড়ায়া আছে পেয়ারা গাছ তার মাঝখানেই গর্ত খুড়ে লুকিয়ে থাকতো আমার নানি পুত্র কন্যা সমেত। অন্ধকারের থেকেও অভাব বেশি ঘুটঘুটে করে রাখতো রাত। এরচেয়ে বেশি যুদ্ধের কথা মনে নাই আমার মায়ের। সজনা গাছে কী বেশুমার ফুল ফুটে আছে আজ!

নানি বাড়ি থেকে দাদি বাড়ির দূরত্ব এক দৌড়ের পথ। এক পাড়া ও ছমছমে বাঁশঝাড় পার হলেই শেষ। তারপর মসজিদ পার হয়ে অন্য তরিকার গ্রাম। এই রাস্তাতেই আমার কিশোর বয়সী বাপ দু-নলা বন্দুক হাতে মিছিল করতো মুক্তির। এইটুক গল্পেই কী পাকা ডুমুরের মতোন ছলছল করে তার মুখ!

আজ, এই বসন্তের রাতে আমাদের ভাসায়া নিয়ে যায় ফসলি হাওয়া, পেয়ারা গাছ সবুজ করে তার নিজস্ব জমিন-

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও মুক্তি

সামন্ততন্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রতাপের মধ্যে পাকিস্তানে যে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে ওই ন্যূনতম দাবিরও স্বীকৃতি মেলেনি। গণতান্ত্রিক কায়দায় প্রাপ্ত জনগণের সম্মতিও তার স্ব-শাসনের অধিকার নিশ্চিত করেনি। বাধ্য হয়েই যেতে হয়েছে পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে।

সাতচল্লিশে পাওয়া স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রটি যে দুই যুগও টিকল না, সে দায় ও দায়িত্ব নিঃসন্দেহে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের পূর্ববঙ্গীয় সমর্থকগোষ্ঠীর। তবে অনেকেই এমন আছেন, বাংলাদেশে এবং দেশের বাইরে, যারা মনে করেন, বাংলাদেশের মানুষেরও এ দায় আছে। এ পক্ষের দাবিটি ঠিক নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিশুদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনা নয়, অনেকাংশেই সামরিক ঘটনা। রাজনৈতিকতাকে সামরিক ভাষায় রূপান্তরিত করার দায় বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নয়। ঐতিহাসিক ঘটনা-পরম্পরা নিশ্চিতভাবে বলছে, এ দায় পাকিস্তানি এলিট সমাজের আর তার সাথে যোগ দিয়েছিল বাংলাদেশের মানুষের ক্ষুদ্র একাংশ। কথাটা খানিকটা বিশদ করা দরকার।

ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এক রাজনৈতিক তৎপরতা। তার সাংস্কৃতিক অংশও সে রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ। এমনকি যখন ছয় দফার স্বায়ত্তশাসন এবং এগার দফার অধিকতর দাবিদাওয়া রাজনীতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, তখনো এর কোনো ব্যত্যয় ঘটে নাই। নির্বাচনের পরের দেনদরবার এবং রক্তাক্ত রাজপথও রাজনৈতিক ভাষার স্তর অতিক্রম করেনি। রাজনীতির সমস্ত আদব লজ্জিত হয়ে রাজনীতির ভাষা যুদ্ধের ভাষা হয়ে উঠেছিল একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে, যখন সামরিক ভাষা বেসামরিক জনতার দখল নিতে চাইল অস্ত্রের ভাষায়। যদি ওই ধ্বংসাত্মক আক্রমণ বেছে বেছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং আদর্শিক প্রতিপক্ষের উপর চালিত হতো, তাহলেও তা হতো জঘন্য গণহত্যা। কিন্তু ওই রাতে এরকম কিছু ঘটেনি। সমস্ত তথ্য-উপাত্ত বলছে, মানুষের সামষ্টিক উপস্থিতিকে কোনোরকম তোয়াক্কা না করে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছিল। জাতিগত নিধনের রূপ নিয়েছিল ওই গণহত্যা।

শুধু যুদ্ধ-ঘোষণা নয়, রীতিমতো গণহত্যার মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-ঘোষণার পর রাজনীতি আর জিন্দা থাকতে পারে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অনেকে পূর্বতন রাজনীতির ধারাবাহিকতার কথা বলেন। অনেকে দাবি করেন, পূর্ববাংলার মানুষ সংগ্রাম করে পাকিস্তান হাসিল করেছে বলে পাকিস্তান রক্ষার জন্য আরও চেষ্টা-তদবির করা প্রয়োজন ছিল। অনেকে বলেন, প্রতিবেশী দেশের ঐতিহাসিক শত্রুতা রাজনৈতিক বিবেচনার কেন্দ্রে থাকা জরুরি ছিল। এর সবকটি যুক্তিই ঠিক আছে। তবে তা রাজনৈতিক ভাষা হিসেবে। একে ভাবাদর্শিক অবস্থান হিসেবেও যথেষ্ট বিবেচনাযোগ্য ভাবার অবকাশ আছে। যদি রাজনৈতিক ভাষা সামরিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে না যেত, তাহলে এর সবকটিই আমলযোগ্য যুক্তি হিসেবে বলবৎ থাকত। কিন্তু পঁচিশে মার্চের যুদ্ধ ঘোষণার পরে রাজনীতি যেমন রদ হয়ে গেছে, ঠিক তেমনি এ যুক্তিগুলোও অচল হয়ে গেছে। রাজনীতির ভাষা ততক্ষণে রূপান্তরিত হয়েছে যুদ্ধের ভাষায়।

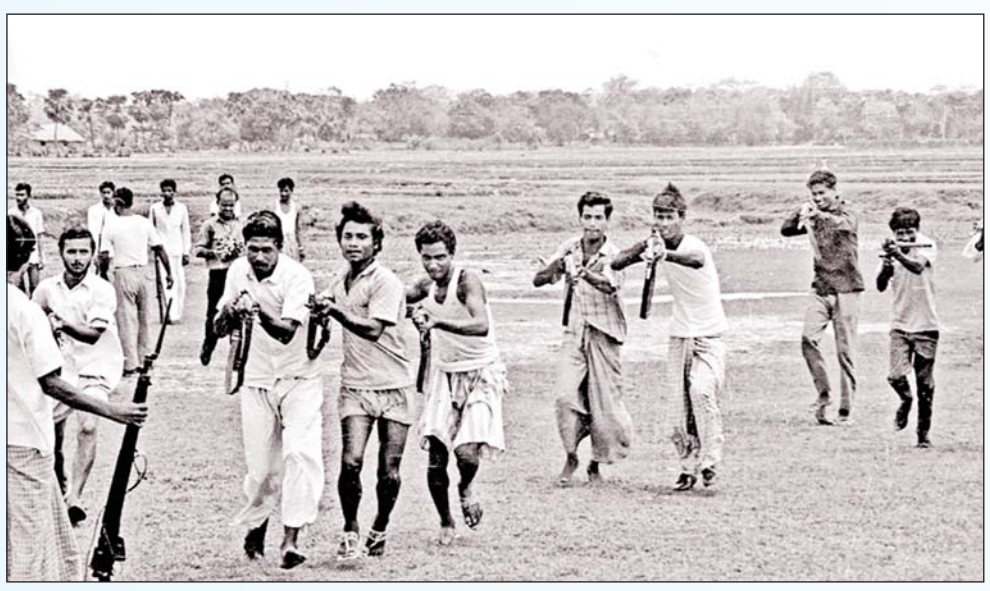

বাংলাদেশের মানুষ এক অন্যায্য অবস্থার মধ্যে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তাই ঐতিহাসিক ন্যায্যতাকেই উচ্চকিত করেছে। লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও নিপীড়ন ভোগ করেছে। শেষ পর্যন্ত আয় করে নিয়েছে স্বাধীনতা।

আমাদের সার্বভৌমত্ব

স্বাধীনতা দাবির আড়ালে আছে সার্বভৌমত্বের আকাঙ্ক্ষা। একটু বেশি করেই আছে। স্বাধীনতাকে যদি ধরি মানচিত্র-প্রাপ্তি, তাহলে সার্বভৌমত্ব তার প্রাণ-ভোমরা। সামষ্টিক অস্তিত্বকে প্রধান ধরে, নিজেকে সে সমষ্টির অংশীজন মনে করেই মানুষ সার্বভৌমত্ব উপভোগ করে। আগেই বলেছি, ধারণাটিতে জটিলতা আছে, আছে বিমূর্ততা ও প্রতীকতার সংকট।

আমাদের ক্ষেত্রে একটা সংকট বোধহয় সীমানার এপার-ওপারের মধ্যে জল-অচল প্রতিপক্ষতার ধারণা। নিশ্চিত করে বলা কঠিন, তবে ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা, তজ্জনিত অবিশ্বাস আর নিজেদের নিয়ন্ত্রণহীনতার মধ্যে সীমানার ভাগাভাগি এ অবিশ্বাসের একটা উৎস হতে পারে। সার্বভৌম কথাটার মধ্যে যেরকম ইশারা আছে, দুনিয়ার কোনো দেশ বা জনগোষ্ঠীই সেরকম নিরঙ্কুশ স্বাতন্ত্র্যে জীবনযাপন করে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার বাইরেও সীমান্তবর্তী মানুষের নানারকম পারস্পরিকতা থাকে। এগুলোকে নীতিগতভাবে এবং আইনের দিক থেকে খানিকটা শিথিলভাবে দেখতে না পারলে বহু মানুষের জীবন জটিল হয়ে পড়ে। সার্বভৌমত্বের ধারণা তার বিমূর্ত মূর্তিতে স্বরাট আকার ধারণ করলে এ ধরনের জটিলতা বাড়ে বৈকি!

সার্বভৌমত্বের আদর্শ ধারণার আরেক বড়ো প্রতিপক্ষ আর্থিক গরিবি। গরিব দেশের পক্ষে সার্বভৌমত্ব বজায় রাখা প্রায়ই খুব দুরূহ হয়ে পড়ে। তাকে ধারদেনা করতে হয় দেদার, যেখানে নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অবদমিত করেই মেনে নিতে হয় শর্তের বেড়াজাল। আর্থিক কায়কারবার তাও চোখে দেখা যায়। কিন্তু অদৃশ্য যেসব জ্ঞাত-অজ্ঞাত ধারদেনার মধ্যে থাকতে হয় আমাদের, তা উপলব্ধির আওতায় আনাও খুব সহজ নয়। সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মনোজাগতিক এসব দেনা আমাদের নিজ দেশে পরবাসী করে রাখে। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্বই তখন নাই হয়ে যায়। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বোধ পরিণত হয় কাগুজে আলঙ্কারিকতায়। এরকম অবস্থায় আত্মতা অর্জনের তুলনায় সীমানার ওপারের দিকে আর বহির্বিশ্বের দিকে মানুষের নজর পড়ে বেশি।

সার্বভৌমত্বের কার্যকর উপলব্ধি সহজ কোনো ঘটনা নয়। আমাদের বরং বেশি নজর দেওয়া উচিত তুলনামূলক মূর্ত ও বাস্তব ধারণা মুক্তির দিকে।

আমাদের মুক্তি

বাংলাদেশের মানুষ সামষ্টিক মুক্তির জন্য লড়াই করছে বহুকাল ধরে। ভৌগোলিক অবস্থান আর উৎপাদনব্যবস্থার বিশেষত্বের কারণে এ অঞ্চলের মানুষ গরিব ছিলো। বাইরের নানা পক্ষের বিস্তর শোষণও তাদের সইতে হয়েছে। কিন্তু একটু দীর্ঘ সময়পরিসরে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, এখানকার মানুষের ইতিহাস খুব ধীর-স্থির অগ্রগতির ইতিহাস। এ জনগোষ্ঠী একটা বিরাট মুসলমানপ্রধান কৃষক জনগোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের আত্মতা চিহ্নিত করেছিল উনিশ শতক জুড়ে। বিশ শতকের গোড়া থেকে তার প্রত্যক্ষ নানারকম রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটতে থাকে। তাতে আত্ম-উন্নয়নের মধ্য দিয়ে মুক্তির অভিপ্রায় স্থির-লক্ষ্য হিসেবে শনাক্ত করা যায়।

বিশ শতকের তিনের দশকে এ অঞ্চলের মানুষ গঠন করেছিল কৃষক-প্রজা পার্টি। অনতিবিলম্বে এ দল রাজনৈতিক ক্ষমতায় চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছিল। তখনকার দিনে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলো বাদ দিলে এ ধরনের নামের ও মতাদর্শের একটা দল দুনিয়াতেই বিরল। কৃষক জনগোষ্ঠীর মুক্তির প্রত্যয়ী আকাঙ্ক্ষার কারণেই এটা সম্ভবপর হয়েছিল। পাকিস্তান আন্দোলনে মুক্তির নতুন দিশা পেয়ে এ জনগোষ্ঠীই আবার সমবেত হয় মুসলিম লিগের ছায়ায়। তাদের সমবেত ভোট ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি এনে দিয়েছিল।

অনেকেই ১৯৪৭-এর স্বাধীনতায় দুনিয়াবি মুক্তির বার্তা খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতা ইতিহাসপাঠের ব্যর্থতাই বটে। পাকিস্তান দাবি ইহলৌকিক মুক্তির নিমিত্তেই সংঘটিত হয়েছিল। তার এক পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তফসিলি সম্প্রদায় এ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। যোগেন মণ্ডল যে পাকিস্তানে টিকতে পারেন নাই, তা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অগণতান্ত্রিক এবং এমনকি সাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রমাণ হতে পারে; কিছুতেই পাকিস্তান আন্দোলনের অযৌক্তিকতার প্রমাণ নয়। যেমন কলকাতায় সৈয়দ মুজতবা আলীর মতো মানুষেরা টিকতে পারেননি। এ তথ্য দিয়ে কলকাতার রাজনৈতিক বন্দোবস্ত চিহ্নিত করা ন্যায্য হয় না।

কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ সাতচল্লিশ-পরবর্তী রাজনৈতিক বন্দোবস্তে নিজেদের মুক্তির সম্ভাবনা সীমিত দেখে চুয়ান্নর নির্বাচনেই মুক্তির নতুন নিশানা অন্বেষণ করেছিল। এ দীর্ঘ যাত্রায় তার দুনিয়াবি দৃষ্টিভঙ্গির বড়ো ধরনের কোনো হেরফের দেখা যায় না। যারা ষাটের দশকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেই কেবল সেক্যুলার ভাব-স্বভাব আবিষ্কার করেন, তারা আদতে নাম ও চিহ্নের পাঠোদ্ধারে ব্যর্থতাকেই বরণ করেন। বলা যায়, ষাটের দশকের তুমুল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আগের দীর্ঘ দুনিয়াবি মুক্তির লড়াইয়ের এত তুরীয় পর্ব। সে যাত্রায় অর্জিত হয়েছিল এক সোনালি স্বাধীনতা। তুলনামূলক অন্তরঙ্গ রাষ্ট্রসীমা ও পতাকার যৌথতায় নিজেদের মুক্তির জন্য নিজেদের আত্মতার উপর নির্ভর করতে পারার সে এক উত্তুঙ্গ মুহূর্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা এদেশের মানুষের মুক্তির দীর্ঘ অভিযান-পরম্পরার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন।

এ কারণেই প্রথম থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধকে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিসংগ্রাম নামে ডাকার চল তৈরি হয়েছে। এ নাম গভীরভাবে তাৎপর্যময়। এ নাম আমাদের মনে করিয়ে দেয়, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মতো বিমূর্ত ধারণা দিয়ে ওই ইভেন্টকে নিঃশেষে উপলব্ধি করা যায় না। মানুষের মুক্তি তথা মৌলিক অধিকারের পরিপূরণ ব্যতীত 'স্বাধীনতা' শব্দটি তার পূর্ণ মহিমায় কিছুতেই উদ্ভাসিত হতে পারে না। নামটি আমাদের এও মনে করিয়ে দেয়, সার্বভৌমত্বের মর্যাদা অন্তত আংশিকভাবে উপলব্ধি করতে হলেও মুক্তির লড়াই অব্যাহত রাখতে হবে।

বাংলাদেশের মানুষ সে লড়াই অব্যাহত রেখেছে। শাসকপক্ষের সংকীর্ণ স্বার্থ ও গোষ্ঠীচিন্তা যখনই জনগণের অধিকার ও মর্যাদার তুলনায় বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, তখনই মানুষ সামষ্টিকভাবে রাস্তায় নেমেছে। প্রণয়ন করেছে নতুন রাষ্ট্রের ইশতেহার। ২০২৪-এ সংঘটিত শিক্ষার্থী-জনতার অভ্যুত্থান সে ধারাবাহিকতার সাম্প্রতিক প্রকাশ। এ গণঅভ্যুত্থান আমাদের মনে করিয়ে দেয়, গণমানুষের মুক্তির বার্তাকে অগ্রাহ্য করে গোষ্ঠীবিশেষের তুষ্টিসাধন সামগ্রিক মুক্তির পথে বড়ো অন্তরায়। বিভাজনমূলক রাজনীতির বিপরীতে রাজনৈতিক জনসমাজ গড়ার নতুনতর প্রস্তাবকে সামনে আনতে পেরেছে বলেই আমাদের অভ্যুত্থানগুলোর মধ্যে এর রাজনৈতিক গুরুত্ব এত বেশি। কিন্তু মনে না রেখে উপায় নাই, এ ঘটনাও ঘটেছে স্বাধীন বাংলাদেশে ইতোমধ্যে অর্জিত জনসমাজ, পতাকা ও সীমারেখার অধীনেই।

এ বছরের স্বাধীনতা দিবসে আমাদের প্রত্যয়, মুক্তির পথে নতুন অর্জিত বার্তাকে শিরোধার্য করে আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে অগ্রসর হবো, আর এভাবেই 'স্বাধীনতা' ও 'সার্বভৌমত্বে'র মতো বিমূর্ত ধারণাকে তুলনামূলক মূর্তরূপে উপভোগ করার সামষ্টিক শর্ত তৈরি করতে পারব। ❐

লেখক : মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি